ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে
জিহাদ করা মুসলমানদের উপর

কেন ওয়াজিব?

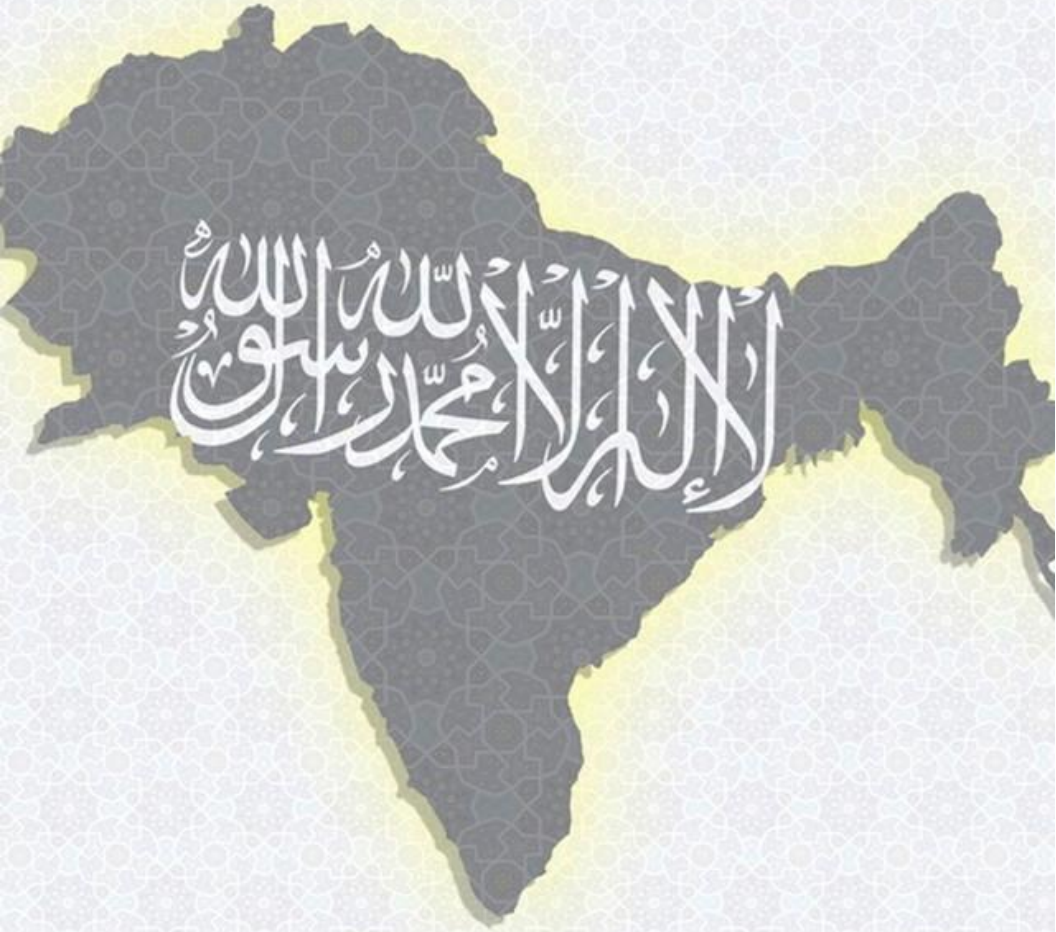

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব?

১ম পর্ব

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ

ভূমিকা

[সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ'র বক্ষ্যমাণ "ভারত উপমহাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুসলমানদের উপর কেন ওয়াজিব?" লেখাটি কতটা গুরুত্ব আশা করছি আপনারা নাম দেখেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। এই প্রবন্ধটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখার অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন "নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ" এর গত জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি সংখ্যায় "বাররে সাগির কে হুকমারানু কে খেলাফ মুসলমানু পার লড়না কিউ ওয়াজিব হায়?" (برصغیر کے حکمرانوں کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر کیوں واجب ہے) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই রিসালাহ'র বাংলা মূল সংস্করণটি লেখক আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যা এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান।

উপমহাদেশে তাওহিদবাদী মুসলিমদের সাথে সাথে হিন্দুত্ববাদী মুশরিকদের যে অমোঘ সংঘাতের প্রেক্ষাপট ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে তার বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য, উপমহাদেশে ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে।

সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।—সম্পাদক]

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

মুসলিম বিশ্ব ও মুসলমানদের অধিকাংশ কাফেলার বর্তমান হালাত দেখলে এমন মনে হয় যে, মুসলমানরা তাদের জন্য এ কথা মেনে নিয়েছে এবং নিজেদের ভাগ্যের বিষয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে, তারা ভবিষ্যতে কখনো দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবে না, যে দায়িত্ব পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে তাদের উপর ছিল এবং তাদের হাতেই ছিল।

তাদের পরিস্থিতি দেখলে এমন মনে হয় যে, তারা তাদের সকল দায় দায়িত্ব সেসব লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যারা তাদের একমাত্র মা'বূদ আল্লাহ তাআলার দুশমন। মুসলমানদের প্রাণের চাইতেও প্রিয় সত্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা দুশমন, সকল মুসলমানের দুশমন, খোদ তাদের জান মালের যারা দুশমন এবং যারা পুরো সৃষ্টিজগতের দুশমন তাদের হাতে দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করে দিয়েছে। মুসলমানরা তাদের যিম্মাদারি হাতে নেয়ার সাহস একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের একমাত্র মাবূদের একক সত্তার সমর্থন করা ও তা প্রমাণিত করার হিম্মত তারা হারিয়ে ফলেছে। নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার হিম্মত তারা হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের জীবনধারা তৈরি করার হিম্মত তারা হারিয়ে ফেলেছে। নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক চালচলন, দিন রাতের সকল কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের যিম্মাদারি নিজেদের হাতে নেয়ার হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে।

অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, 'একমাত্র মাবূদ আল্লাহ তাআলা, তাঁর কোন শরিক নেই' মুসলমানদের এ আকীদা লালন করতে হলে কোন রামজি (কোন হিন্দু) থেকে বা কোন মিস্টার (কোন ইহুদী-খ্রিস্টান-নাস্তিক) থেকে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে! মুসলমানরা তাদের দেশ ও তাদের আদালত কোন আইনে পরিচালনা করবে, তা কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিকহকে জিজ্ঞেস না করে অমুসলিম নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে তা শিখতে হবে!! মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কোন পদ্ধতিতে জীবন যাপন করবে? তা আল্লাহর কোন দুশমনকে জিজ্ঞেস করতে হবে!!! কোন

মুসলমান যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে তাকে আজীবনের জন্য নিজের উপর হারাম করে ফেলে, তখন সে হারাম স্ত্রীর সঙ্গে বাকি জীবন কাটাতে হবে? না কি কাটানো যাবে না? এ ফাতওয়াও কোন হিন্দু থেকে নিতে হবে!!! কোন মুসলিম যুবক কোন মুসলিম যুবতির সঙ্গে মিলন করতে চাইলে তাদের বিবাহ হওয়া জরুরী কি জরুরী নয়? তাও কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করতে হবে, অথবা এ ফাতওয়া এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে নিতে হবে, যে এ বিশ্বজগতের জন্য কোন সৃষ্টিকর্তাকেও স্বীকার করে না, এবং এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার একটি জীবন হবে সে কথাকেও সে স্বীকার করে না!!!

চলমান পৃথিবীতে এ বিষয়টি কোন কাল্পনিক ও সন্দেহযুক্ত বিষয় নয়, এমনিভাবে এটি কোন নিরাশ ব্যক্তির অপলাপ বা নিঃস্ব ব্যক্তির দুঃস্বপ্নও নয়; বরং তা এখন প্রতিদিনের বাস্তবতা এবং সকাল সন্ধ্যার দৃশ্য। তবে আমাদের অনুভূতিশক্তি ও উপদেশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তি এতটাই ব্যবধানপূর্ণ যে, এসব পরিস্থিতি দেখে কারো তো ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে, সব কিছু বিষাদ হয়ে গেছে এবং দীর্ঘ দিন থেকে স্থির জীবন হাতছাড়া হয়ে তারা অস্থির জীবন যাপন করে চলেছেন। অস্থির পায়চারী করে চলেছেন। অপর দিকে কারো কারো নিশ্চিন্ত, পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তির জীবন এতটাই রসে টইটম্বুর যে, সকাল সন্ধ্যার আনন্দ বিনোদন, রাত দিনের বিলাস বসন ভূষণ, প্রতি মুহূর্তের সাজ সজ্জার মাঝে বিন্দু বরাবরও ছেদ পড়েনি। তাদের ছন্দময় জীবনের কোথাও ছন্দের পতন ঘটেনি। আর আকাশ যমিনসম পার্থক্যের এ উভয় স্তরের মাঝে আমাদের মত মানুষদের এত এত স্তর রয়েছে যা গুনে শেষ করা যাবে না।

পরিস্থিতি এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অকাট্য সুস্পষ্ট ফরয বিধানগুলোকে ধারণানির্ভর সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহের তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিদিনের পালনীয় অনস্বীকার্য শরয়ী বিধানগুলোকে অনর্থক বলা হচ্ছে, সকাল সন্ধ্যার ফরয ওয়াজিব আমলগুলোকে ফলাফলশূণ্য আমল বলা হচ্ছে। কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর উদ্ধৃতিগুলোর ইলমী পর্যালোচনা না করে, উদ্ধৃতি দেয়াকে অজ্ঞতা ও অগভীরতা হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। ইলমী পর্যালোচনাকে বেয়াদবি ও বদআখলাকির শিরোনাম দিয়ে বদনাম রটানো হচ্ছে।

এসকল পরিস্থিতি থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং হালাত থেকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ চলমান পরিস্থিতির কিছু কিছু বিষয় নিয়ে লিখতে ও বলতে খুবই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। তারা দলিল প্রমাণের আলোকে নিজেদের চিন্তা চেতনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করতে সাহস পান না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের দলিলনির্ভর সে চিন্তা চেতনা সমাজের প্রথাগত ধ্যানধারণার অনুকূলে না হয়।

কিন্তু পরকালের জবাবদিহিতা এমন একটি বিষয় যা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ধনী গরিব, ক্ষমতাবান ও নিরীহ সবাই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হতে হবে, তা একটি অকাট্য বিষয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যিম্মাদারি সম্পর্কে জবাব দিতে হবে, তা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তাই আমরা বলব-

উপমহাদেশ অর্থাৎ বর্তমানের পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত ইতিহাসের বিচারে আমাদের দেশ? না কি আমাদের দুশমনদের দেশ? না কি এগুলো শত্রু-মিত্র, দোস্ত-দুশমন সবার দেশ? আমি যখন এ প্রশ্নটি করছি তখন আমার এ কথা স্পষ্ট করে জানা আছে যে, চলমান সময়ে এটি এমন একটি প্রশ্ন যে প্রশ্নের প্রশ্নকারী দোস্ত দুশমন সবার দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ও দোষী। বরং আরেক ধাপ এগিয়ে যদি বলা হয়, বর্তমান পৃথিবীতে এ ধরনের প্রশ্ন একটি অত্যাশ্চর্য বিষয় এবং চলমান পৃথিবীর প্রত্যাখ্যাত বিষয়গুলোর একটি, তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না।

আমরা যে সময়ে 'আমাদের' বলে আমরা মুসলামন এবং 'দুশমন' বলে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে উদ্দেশ্য করছি, সে সময়ে পৃথিবীতে মানব সম্প্রদায়গুলোর মাঝে এমন পার্থক্য করা এবং মানবগোষ্ঠীকে এভাবে ভাগ করা বৈধ নয় (?) এবং এ ধরনের বিভাজনের অনুমতি নেই।

কিন্তু, যে জগত স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্ক, যে রাসূলে আরাবীর সাথে আমাদের পরিচয় এবং যে পূর্বসূরি সালাফে সালেহীনের আমরা উত্তরসূরি সে জগতস্রষ্টার আদেশ, সে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকনির্দেশনা এবং সেই সালাফে সালেহীনের ইতিহাস থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই

যে, সত্য ও হক কথা আমরা না বলে থাকতে পারব না। আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমরা এ অনুমতি পাব না। এটা আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং পূর্বসূরিগণের আমানতের খেয়ানত হবে। অতএব সত্য ও হক কথাতো আমরা বলবই। শরয়ী যিম্মাদারি থেকে আমরা সে কথাগুলো বলব। কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীর আলোকে বলব। আল্লাহ তাওফীক দান করুন! আল্লাহ সাহায্য করুন!!

ইতিহাস বলে, উপমহাদেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের ভূখণ্ডগুলো মুসলিম শাসক ও ইসলামী আইন কানূনের অধীনে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছে। যখন কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ভূখণ্ডগুলো দারুল ইসলাম ছিল। যদিও আমরা এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করি না যে, এ ভারত উপমহাদেশের ঐতিহাসিক পর্বগুলো পরস্পরে অনেক ব্যবধানপূর্ণ; বরং আপনি বলতে পারেন, পর্বগুলো অনেক পেঁচানোও। আপনি যদি বলেন যে, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি শতাব্দীই তার আগের ও পরের শতাব্দী থেকে ভিন্ন রকমের, তাহলে এ দাবি আপনি করতে পারবেন। এ দাবি অবাস্তব হবে না। বিশেষভাবে এর ভৌগলিক সীমারেখা বিভিন্ন রকম হতে থেকেছে এবং মুসলিম শাসকদের ঈমান আকীদার হালাতও বিভিন্ন রকমের ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও ছিল যাদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান বলাও মুশকিল। আর কেউ ছিল এমন, যাদেরকে মুসলমান বলা গেলেও না তারা সহীহ আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী ছিল, আর না তারা সহীহ আকীদার সঙ্গে পরিচিত ছিল। এসব কারণে ইতিহাসের প্রতিটি পর্বের সুনির্দিষ্ট হালাত হিসাবে এর মূল্যায়ন একটু কঠিন।

তবে ইতিহাসের যে অংশের বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই এবং যে অংশের উপর অস্পষ্টতার কোন পর্দা নেই, তার শরয়ী মূল্যায়ন আমাদের সামনে এসে গেলে আমাদের বর্তমানে চলমান বিষয়গুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ অনেক সুবিধা হবে। এমনিভাবে যেসব বিষয়ে অস্পষ্টতার কারণে আমরা সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলতে সাহস পাই না, সেগুলোও স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে যেসকল মুসলিম শাসক ইসলামী আইন ও শরয়ী বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করার চেষ্টা করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহের বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ নিয়েছেন তাঁদের নাম এই-

* নাসিরুদ্দীন মাহমূদ ৬৬৪ হিজরী

* গিয়াস উদ্দীন বলবান ৬৮৬ হিজরী

* আলাউদ্দীন খিলজী ৭১৬ হিজরী

* শামসুদ্দীন আলতামাশ ৭৩৩ হিজরী

* মুহাম্মাদ তুগলুক ৭৫২

* ফিরোজ শাহ ৭৯৯ হিজরী

* সেকান্দার ইবনে বাহলুল লূধী ৯২৩ হিজরী

* শের শাহ সূরী ৯৫২ হিজরী

* শাহজাহান তৈমুরী ১০৬৮ হিজরী

* আওরঙ্গজেব আলমগীর ১১১৮ হিজরী

উল্লেখিত শাসকবর্গ ছাড়া আরো কিছু শাসক ও আমীর উমারা এমন অতীত হয়ে গেছেন, যারা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত তারা সফলও হয়েছেন। এ ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন মুগল সাম্রাজ্যের শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ যাফর, যার পরে ইসলামী হুকুমত নামেমাত্র যতটুকু ছিল তাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে এসে হিন্দুস্তানকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এর যে ঐতিহাসিক ফাতওয়া রয়েছে, তার কিছু

প্রেক্ষাপটও আমাদের আলোচনায় এসে গেলে ভালো হবে এবং আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সে প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনা করতে যাব না; বরং তার সে অংশটি আলোচনায় আনব যে অংশের সাথে আমাদের এ আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে এবং যে অংশটি স্পষ্ট করার দ্বারা আমাদের আলোচ্য বিষয়টির সমাধানে পৌঁছতে কোন প্রকার দ্বিধা থাকবে না ইনশাআল্লাহ। এমনিভাবে প্রেক্ষাপটের যে অংশটি সামনে আসার দ্বারা বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অন্য অংশগুলো দেখার প্রয়োজন হবে না, সে অংশ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হিন্দুস্তানে (উপমহাদেশ) যত দিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের অধীনে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ছিল, তত দিন পর্যন্ত এ ভূখণ্ডকে দারুল হারব ঘোষণা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং তখন এ ভূখণ্ডকে দারুল হারব বলা জায়েযও ছিল না। কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং রাজত্ব ও শাসন মুসলিম শাসকদের হাত থেকে অমুসলিমদের হাতে চলে গেছে, তখন এ উপমহাদেশের আসল অবস্থা অর্থাৎ এ ভূখণ্ডের শরয়ী অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়া জরুরী ছিল। বিশেষত যখন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজ উদদৌলা এবং ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফতেহ আলি টিপু ইংরেজদের হাতে শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে গেছে। তখন মুসলমানদের কাছে এমন কোন প্রতিরোধ শক্তি অবশিষ্ট থাকেনি, যে শক্তি দিয়ে ইংরেজদের মোকাবেলা করা যায়, অথবা এমন কোন শক্তি ছিল না, যে শক্তি দিয়ে নিজেদের শাসিত ভূখণ্ডের মধ্যে ইসলামী আইন ও শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা যায়।

দিল্লিতে মুগল সাম্রাজ্যের নিভু নিভু বাতিটি তখনো একেবারে নিভে যায়নি। মুগল সাম্রাজ্য তখন শাহ আলম সানীর হাতে ছিল। বাস্তব কথা হচ্ছে, শাহ আলমের হাতে তখন দিল্লি লালকেল্লার শুধুমাত্র দালানগুলো ছিল এবং শাহী আরাম আয়েশ ও সাজসজ্জার উপকরণগুলো ছিল। মুসলমানদের শাসক হিসাবে তার হাতে কিছুই ছিল না। হিন্দুস্তানের উপর না কেন্দ্রীয় হুকুমতের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল, আর না আঞ্চলিক শাসকদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল। ইংরেজ ও অন্যান্য অমুসলিম শক্তিগুলো

এসকল হালাতকে যথাযথভাবে আঁচ করে নিয়েছিল এবং শতভাগ স্বাধীনতার সাথে রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছে। আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান ও আইন প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। আর সামরিক শক্তিগুলোতো আগে থেকেই তাদের হাতে ছিল। মোটকথা হিন্দুস্তানের এমন অবস্থা ছিল, যে অবস্থায় কোন যিম্মাদার আলেম এবং উম্মতের কোন রাহবার স্বস্তির সাথে বেঁচে থাকতে পারেন না। নিজের উপর অর্পিত শরয়ী যিম্মাদারী আদায় না করে এবং নিজের ফরয দায়িত্ব আদায় না করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন না।

সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ হিন্দুস্তান দারুল হারব হওয়ার ফাতওয়া দিলেন এবং একজন রাহবার হিসাবে উম্মতকে এ বার্তা পৌঁছে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের যিম্মাদারিতে এমন কিছু ফরয দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেসব যিম্মাদারি একটি দারুল ইসলামের অধিবাসী হিসাবে তোমাদের উপর আগে ছিল না।

যেসকল প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এবং যেসকল কারণে এ ফাতওয়া সময়ের অনিবার্য ফরয দায়িত্ব ছিল সে কারণগুলো হচ্ছে এই-

১. হিন্দুস্তানে ইসলামী শরীয়তের আইনি অবস্থান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

২. হিন্দুস্তানের প্রধান শাসক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন না।

৩. আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো, আদালত ও আইন প্রণয়ন এসেম্বেলীর উপর কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ চলত না।

৪. আইনের সকল প্রতিষ্ঠান, আদালতসমূহ ও আইন প্রণয়ন এসেম্বেলীগুলো অমুসলিম শক্তির মতামত ও সিদ্ধান্তের অধীনে এবং তাদের মর্জির অধীনে ছিল।

৫. মুসলিমরা তাদের ইবাদাত, লেনদেন ও ইসলামী চালচলনের ততটুকুই করতে পারত, যতটুকু তারা অনৈসলামিক আইন ও অমুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে করার অনুমতি পেত।

৬. সেই শাসন ব্যবস্থা তাদের খরচে মাদরাসা চালাত। কিন্তু মাদরাসায় যেসব মাসআলা পড়ানো হত সেসব মাসআলা সমাজে বাস্তবায়ন করতে দিত না।

৭. সে শাসন ব্যবস্থার কর্ণধাররা মাদরাসার প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করত, কিন্তু কুরআন ও হাদীসের বিধি বিধানকে তারা অন্তর থেকে ঘৃণা করত।

হিন্দুস্তানের এ হালাতগুলো এমন ছিল যার বাস্তবতাকে শত্রু-মিত্র কেউ অস্বীকার করতে পারত না, আর না এগুলোকে অস্বীকার করার কথা তাদের কারো মনে কখনো উঁকি দিয়েছে। কেননা এ হালাতগুলো এমন সূক্ষ্ম তার ও চিকন পাইপ লাইনের মাধ্যমে এ সমাজকে ঘিরে নিয়েছিল যে, অধিকাংশ মুসলমানের খবরও ছিল না, কোথাকার পানি কোথায় গড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু দ্বীনের সচেতন দায়িত্বশীলগণের চোখ এমনভাবে খোলা থাকে যে, তাদের সামনে দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কোন পরিস্থিতি এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোন পর্ব তাঁদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারে না। পরিস্থিতির শরয়ী বিচার বিশ্লেষণ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ এ ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব বলে ফাতওয়া দিলেন এবং আল্লাহর বান্দাদের এমন একটি কাফেলা দাঁড়িয়ে গেল যারা এ ফাতওয়ার আলোকে যা যা করার ছিল তা তা করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এ ফাতওয়ার প্রেক্ষাপট এবং যেসকল পরিস্থিতির ভিত্তিতে এ ফাতওয়া দেয়া হয়েছিল সেসব কারণ এখনো হুবহু সেভাবেই বহাল রয়েছে যা এ ফাতওয়া দেয়ার সময় ছিল।

এ ফাতওয়ার প্রায় সোয়া দুইশত বছর পরের সময় আমরা এখন পার করছি। এ সময় পার করতে গিয়ে আমরা এখন দেখব, যেসব প্রেক্ষাপট এবং যেসব কারণকে

সামনে রেখে দুইশত সোয়া দুইশত বছর আগে ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করা হয়েছিল, সেসব কারণ ও সেসকল পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে আজো পর্যন্ত বিরাজ করে আসছে? না কি নয়?

এ বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, বিগত দুই শত বছর যাবত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থেকেছে। আর এটি একটি অসম্ভব বিষয় যে, এত দীর্ঘ কাল যাবত কোন প্রকার পটপরিবর্তন ছাড়াই দুনিয়া চলবে। এটা হতে পারে না। কিন্তু আমরা যে দিকটি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা বলতে চাচ্ছি, শরীয়তের মাপকাঠিতে যদি বিচার করা হয়, তাহলে যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, দুইশত বছর আগের অবস্থা এবং দুইশত বছর পরের অবস্থার মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য হয়নি, কোন ব্যবধান আসেনি।

একটু চিন্তা করে দেখুন-

১. ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আইনপ্রণয়ন এসেম্বেলী, আদালতসমূহ এমনিভাবে কোন আইনী প্রতিষ্ঠানের উপর কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন প্রকার প্রধান্য নেই, কোন হাত নেই।

২. উপমহাদেশের এ তিনটি দেশেই প্রতিটি আইন ও প্রতিটি কানুন সেসব দেশের শাসকবর্গের মতামত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে হয়, সে শাসক মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক।

৩. বরং বৃটিশ এ দেশকে যে আইনের উপর পরিচালিত করে একটি দারুল ইসলামকে দারুল হারব বানিয়ে ছেড়েছিল, সেই বৃটিশ আইন কানুন আজও এ উপমহাদেশের দেশগুলোতে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য এবং পরিপূর্ণ সতেজতার সাথে কার্যকরী ও বহাল রয়েছে।

৪. এ দেশগুলোর উপর এমনসব শাসকদের আধিপত্য রয়েছে, যারা পরকালে মুক্তির জন্য শুধুমাত্র একটি ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের অনুসরণকে জরুরী মনে করে না।

৫. উপমহাদেশের এ দেশগুলোতে যেসব শাসক রয়েছে তাদের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে, মুসলমানরা তাদের ইসলামী আইন কানুন অনুযায়ী চলতে হলে, শাসকদের বানানো আইন কানুনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অমুসলিমদের বানানো আইন থেকে অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমনদের বানানো আইন কানুন থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৬. এ শাসকদের আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে, ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে, কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কোন আইন কানূন বানানো এবং তা প্রয়োগ করা অপরাধ এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এসব বিষয়ে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ অর্থাৎ সাবেক হিন্দুস্তান (উপমহাদেশ) এর তিনটি দেশেরই অবস্থা বরাবর। এর মাঝে পার্থক্য যতটুকু আছে, তাও আমরা বলব। এরকমভাবে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রহিমাহুল্লাহ যে সময়ে এ উপমহাদেশকে দারুল হারব হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন সে সময়ের অবস্থা এবং বর্তমানের অবস্থাও বরাবর। এ দুয়ের মাঝে যতটুকু পার্থক্য আছে তাও আমরা বলব ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যায়ে এসে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, দারুল হারব হিসাবে হিন্দুস্তান তিনটি পর্ব অতিক্রম করেছে। একটি পর্বতো হচ্ছে, যখন ফাতওয়াটি দেয়া হয়েছে। তখন শাসক ছিল মুসলমান, কিন্তু আধিপত্য ছিল অমুসলিমদের। আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে এবং অনৈসলামিক আইনের অধীনে চলত। এ পর্বটি হচ্ছে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে, যখন শাসক অমুসলিম ছিল। এ পর্বটি ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। তৃতীয় পর্ব হচ্ছে, যখন কিছু অংশের শাসক মুসলিম আর কিছু অংশের শাসক অমুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক অংশের উপরই আধিপত্য অমুসলিমদের। আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিম ও অনৈসলামিক আইনের অধীনে আছে। এ পর্বটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত চলছে।

এ তিনটি পর্বের পরস্পরে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তার কিঞ্চিত বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে এ ভূখণ্ডের নাম ছিল হিন্দুস্তান। এখন এ ভূখণ্ড আলাদা আলাদা তিনটি নামে পরিচিত: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

প্রথম পর্বে এ ভূখণ্ডের শাসক ছিল মুসলমান, দেশ নামেমাত্র মুসলমানদের হাতে ছিল। কিন্তু সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর অমুসলিমদের আধিপত্য ছিল। দ্বিতীয় পর্বে শাসক অমুসলিম ছিল। আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরই হাতে ছিল। আর তৃতীয় পর্বে কিছু অংশের শাসকরা নিজেদেরকে অমুসলিম মনে করে, আর কিছু অংশের শাসকরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে। তবে সবার আদালত এবং আইনের প্রতিষ্ঠানগুলো অমুসলিমদের তত্ত্বাবধানে অনৈসলামিক আইনের অধীনে চলে। প্রত্যেক অংশের শাসকবর্গ, চাই তারা নিজেদেরকে মুসলিম মনে করুক বা অমুসলিম মনে করুক, প্রত্যেকে এ আকীদা বিশ্বাস লালন করে যে, আদালত ও আইনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়াতের প্রবেশ এবং শরয়ী আইন তথা কুরআন সুন্নাহর আইনের প্রভাব বা প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চলমান সময়ের সবচাইতে বড় অপরাধ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান এবং উম্মতের রাহবারগণ অমুসলিমদের আধিপত্য এবং অনৈসলামিক আইনের অধীনস্থতার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু তৃতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান অমুসলিমদের আধিপত্য এবং অনৈসলামিক আইনের অধীনতাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে, অথবা তার বিষয়ে নির্লিপ্তভাবে চুপচাপ আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অধিকাংশ মুসলমান এসকল পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া এবং নিজেদেরকে মুক্ত করার বিষয়টিকে একটি শরয়ী যিম্মাদারী মনে করত। এখন অধিকাংশ মুসলমান মনে করে, অনৈসলামিক শাসন এবং অনৈসলামিক আইন আদালতের অধীনে জীবন যাপন করাও জীবন যাপনের একটি পদ্ধতি হতে পারে। তবে এদের মধ্য থেকে কেউ মনে করে, এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন পথ নেই। আর কেউ মনে করে, এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। যেসব মানুষ এসব পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করে এবং মুক্ত

হওয়াকে সম্ভব মনে করে চেষ্টাও করে যাচ্ছে, তাদের কথাও আলোচনায় আসা দরকার। যদিও তাদের অধিকাংশই ভুল পদ্ধতিতে তা করে চলেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অমুসলিমদের প্রতিনিধিদেরকে গভর্নর ও ভাইসরয় বলা হত, এখন তাদের প্রতিনিধিদেরকে এম্বেসেডার, দূত ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি বলা হয়।

প্রথম পর্বে অমুসলিমদের আধিপত্যের কোন আইনি স্বীকৃতি ছিল না, তবে তাদের বাহুবল চলত। দ্বিতীয় পর্বে সব কিছু তাদেরই হাতে ছিল। তৃতীয় পর্বে তাদের আইনি স্বীকৃতি হয়ে গেছে এবং তাদের বাহুবল চলমান থাকা সত্ত্বেও তাদের আধিপত্যকে গোপন করার জন্য অনেক কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে বিষয়গুলো সবাই জানেও, আবার সবাই লুকাতেও থাকে। যাকে আপনি ওপেন সিক্রেটও বলতে পারেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে মনে করা হত, মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক আইনের অধীনে জীবন যাপন করা জায়েয নেই। তৃতীয় পর্বে ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে এ কথা মনে করা হচ্ছে যে, মুসলমানদের জন্য অনৈসলামিক আইনের অধীনে জীবন যাপন করতে কোন সমস্যা নেই।

স্মর্তব্য যে, এ পার্থক্যগুলো এমন কিছু পার্থক্য যা মূল মাসআলার মধ্যে কোন প্রকার প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ এ পার্থক্যগুলোর কারণে কোন দারুল হারব দারুল হারব হওয়া থেকে বের হয়ে আসে না। এ পৃথিবীর কোন একটি ভূখণ্ড দারুল হারব হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো সেখানে পাওয়া যাওয়া জরুরী, সে বিষয়গুলো উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে (ভারত উপমহাদেশে) ছিল, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরেও সে বিষয়গুলো (ভারত উপমহাদেশে) উপস্থিত ছিল এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত সে বিষয়গুলো বহাল আছে।

এরই সাথে সাথে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশ (হিন্দুস্তান) দারুল হারব হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর মুসলমানদের উপর যে সকল ফরয দায়িত্ব এসেছিল, এমনিভাবে যেসকল ফরয দায়িত্ব ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানদের উপর ছিল,

সেসকল ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত মুসলমানদের যিম্মাদারিতে রয়েছে গেছে। চাই সে ভূখণ্ডের নাম ভারত হোক, চাই সে ভূখণ্ডের নাম পাকিস্তান হোক, চাই সে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ হোক। এ সকল ভূখণ্ডের সকল মুসলমানের উপর সেসব ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব হুবহু সেভাবেই বহাল আছে যেভাবে তা দুইশত বছর আগে ফরয ওয়াজিব ছিল। কেননা সেসব ফরয ওয়াজিব দায়িত্ব তাদের যিম্মাদারিতে না থাকার এবং সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার মত কোন পর্ব বিগত দুইশত বছরে কখনো অতিক্রম করেনি।

***